ছাত্ররাজনীতি সংঘাতময় হয়ে ওঠার নেপথ্যে

এ দেশের রাজনীতিতে স্বৈরশাসকেরা একটা বিশেষ স্বৈরসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই রাজনৈতিক কারণে যখনই কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ করেছে তখনই তারা আদমজীতে খুনখারাবির মতো ঘটনা ঘটিয়ে পরে গোটা দেশে তা বিস্তৃত করার চেষ্টা চালিয়েছে। আধা ঔপনিবেশিক শাসন ও সামরিক শাসনের অবসান হলেও প্রকৃতিগতভাবে যারা স্বৈরাচারী তাদের শাসন বাংলাদেশে বহুদিন যাবত বিদ্যমান থাকায় স্বৈরশাসনের সংস্কৃতি এখনও অব্যাহত আছে।

আদমজী বন্ধ করে দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার লক্ষ্যে এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হতেই সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর একাধিক সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত করা হয়েছে। ভাবটা এমন যে, আদমজীর শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে সশস্ত্র সংঘাতেই লিপ্ত রয়েছে। আসলে শ্রমিকদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে সরকার আদমজী বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে করে জনগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না হয়।

একইভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার যে পাঁয়তারা সরকারের তরফ থেকে চলছে তারই পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে সরকার এখন শিক্ষাঙ্গনে সংঘাতের উস্কানি দেবে বলেই মনে হচ্ছে। বুয়েটে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সরকারী দলের সমর্থকরা টেন্ডারবাজি করতে গিয়ে মেধাবী ছাত্রী সনিকে হত্যা করেছে। সেই সুবাদে সেখানে এখন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। আর গত ২৬ জুলাই থেকে শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী তাণ্ডব। রাত তিনটায় কিছু মহিলা পুলিশ সঙ্গে থাকলেও অধিকাংশ ছিল পুরুষ পুলিশ, যারা শামসুন্নাহার হলের প্রতিরুমে ঢুকে ছাত্রীদের যথেচ্ছভাবে লাঠিপেটা করেছে। তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে। তবে ঐ অশালীনতার মাত্রা যে কি ছিল তা কাগজে প্রকাশ পায়নি, পাওয়ার কথা নয়। হয়ত কিছুদিন পর জানা যাবে। রাত ৩টার সময় মহিলা ছাত্রাবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ঢোকার অনুমতি যে কিভাবে পেল তা ভাবতেও অবাক লাগে। হয়তবা পুলিশ কারও অনুমতির তোয়াক্কা করেনি। আসল জায়গা থেকে অনুমতি পাওয়ার পর যা হবার তাই হয়েছে। সাধারণ ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ, একমাত্র সরকারী দল ছাড়া সমস্ত ছাত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছে। মিটিং-মিছিল করেছে। তখন আবার ছাত্রদলের ছাত্ররা পুলিশের সহযোগিতায় তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, লাঠিপেটা করেছে, অনেক ছাত্রী আহত হয়েছে। একমাত্র '৭১ সালে ছাড়া এভাবে ছাত্রীদের হলে ঢুকে রাত ৩টার সময় তাদের ওপর নির্যাতন ও গ্রেফতার আর কোন সরকার করেছে বলে মনে হয় না। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেও সরকার যে তার স্বৈরাচারী সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, এ ধরনের ঘটনাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকার তার দলীয় সমর্থকদের দিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় যাতে দেশের মানুষ ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কেননা, এখনও রাজনৈতিক ব্যক্তি মাত্রই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করণের বিপক্ষে। ঠিক এরূপ একটা পরিস্থিতিতে যদি সাধারণ মানুষের ভিতর ছাত্ররাজনীতিবিরোধী

ডা. এসএ মালেক

একটা মনোভাবের সৃষ্টি করা না যায় তবে সরকার তার উদ্যোগে সফল হবে বলে মনে হয় না। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধকরার কথা সেই পাকিস্তান আমল থেকেই, যখনই স্বৈরশাসকরা কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তখনই বলেছে; তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বন্ধ করতে পারেননি। আসলে এটা কোন দলীয় ব্যাপার নয়, জাতীয় সমস্যা। অবশ্য নিষিদ্ধ করা আর ছাত্ররাজনীতিকে অশুভ তৎপরতার দিকে পরিচালনা করা এক কথা নয়। এ কথা সত্য, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে তাদের টেন্ডারবাজিতে জড়িয়ে পড়তে হবে কেন? কেন তারা বাইরের লোকদের ধরে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আটক রেখে অর্থ আদায় করে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে ঐ ধরনের নোংরামি চলতে দেয়া যায় না। ব্যক্তিবিশেষ তাদের স্বার্থের কারণে ছাত্ররাজনীতিকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে আর তার দায়দায়িত্ব ছাত্র সমাজকে মেনে নিতে হবে কেন? ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে উচ্চ শিক্ষার জন্য, অর্থ উপার্জন যদি শিক্ষা জীবনের লক্ষ্য হয় তবে কর্মজীবনে তারা কি করবে?

এদের কারণে ছাত্রসমাজ অতিষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি স্কুল-কলেজেও তারা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। যেহেতু বিরোধী দল থেকে কোন প্রতিরোধ নেই–এরা নিজেরাই এখন নিজেদের হত্যা করছে। পরস্পর ভয়াবহ সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। এদের কারণে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি নেই, নিরীহ ছাত্র জীবন দিচ্ছে। এদের কারণেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া এখন ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। দলীয় ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এই ধরনের চিন্তা করছেন। আসলে আর্মস ক্যাডার হিসাবে যাদের অতীতে ব্যবহার করা হয়েছে তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করতে না পারে তাহলে তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরে তৎপরতা শুরু করবে এবং তাতে করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে আরও অবনতি হবে তা তো সহজেই অনুমেয়।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে, ছাত্ররাজনীতি বলতে কোন ধরনের রাজনীতি বোঝায় এবং দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তার পার্থক্যটা কি। দলীয় রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি একটা রাজনৈতিক দলের আদর্শ বাস্তবায়নের রাজনীতি, যাতে ঐ দল বিশ্বাসী। রাজনৈতিক দল বলতে আমরা বুঝি একটা সুশৃঙ্খল নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন– দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর যার সমর্থক। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক মতে ও পথে রাজনীতি করা এবং দলকে ক্ষমতাসীন করে দলীয় আদর্শভিত্তিক দেশ পরিচালনা করা। রাজনৈতিক দলের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন এবং সেই ক্ষমতা পেতে হলে একমাত্র জনগণের সমর্থনেই তা করা সম্ভব এবং সে কারণে একটা রাজনৈতিক দলকে অনেক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এমন অনেক দল আছে যাদের ক্ষমতার প্রয়োজন শুধু সম্পদ আহরণের জন্য। ছাত্ররাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের কোন ব্যাপার নেই। সমাজের সচেতন নাগরিক হিসাবে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব হচ্ছে জাতিকে সচেতন করা। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ জনগণকে সতর্ক করে দেয়। জাতির জন্য যা মঙ্গলজনক তার দিকনির্দেশনা দেয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এ দেশের ছাত্র সমাজ গণমানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজস্ব ধারায় রাজনীতি করে আসছে। তাদের আন্দোলনের প্রকৃতি হচ্ছে অন্যায়, অসুন্দর, অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়া। জাতীয় প্রয়োজনে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি। অনেক গণবিরোধী শাসকের কুশাসন থেকে ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতিকে রক্ষা করেছে। সঠিক সময় সঠিকভাবে পথ দেখিয়েছে। ছাত্ররাজনীতিতে তাই ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে; প্রাপ্তির কোন সুযোগ নেই। জেল, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন আছে, নির্যাতন আছে; ব্যক্তিস্বার্থ বা লালসা চরিতার্থ করার কোন অবকাশ নেই। ছাত্ররাজনীতি বলতে বোঝায় আদর্শের রাজনীতি। জাতীয় রাজনীতির প্রস্তুতিপর্ব হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি। ৫০/৬০/৭০ দশকের সকল ছাত্রনেতাই আজ জাতীয় রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্যাগ, তিতিক্ষা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণেই তারা আজ জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলে ছাত্ররাজনীতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা খুব সহজসাধ্য নয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিবেচনায় ছাত্ররাজনীতি জাতীয় রাজনীতি থেকেও দুরূহ বলে প্রতীয়মান হয়।

সবকিছু দেখেশুনে মনে হয়, সরকার ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী খোলাখুলিভাবেই কথাটা বলে ফেলেছেন। শুধু বলেননি, টেস্ট কেস হিসাবে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি স্থগিত করা হয়েছে, এমনকি ছাত্র সংসদের কাজও সাসপেন্ড করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। যদিও উপাচার্য বিবিসিকে বলেছেন যে ব্যবস্থাটা সাময়িক, তবে কারও বুঝতে বাকি নেই যে, এখান থেকেই কাজটা শুরু করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ার পর সেখানে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেও কোন প্রতিক্রিয়া সেখানে আপাতত হবে না বলেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি বেছে নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, একটা দলেরও প্রধান। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং অন্যান্য দলের মতো সে দলেরও দেশব্যাপী ছাত্র সংগঠন রয়েছে। বিরোধী দলে অবস্থান করার সময় বেগম জিয়া তাঁর সোনার ছেলেদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন। ঢাকা শহরে একটা হরতাল ডাকলে মুহূর্তের ভিতর হাজার হাজার বোমা বিস্ফোরিত হতো। সরকারী অফিসে অগ্নিসংযোগ, সামান্য কারণে যানবাহন বন্ধ করে দেয়া, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের অফিস আক্রমণ, আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীর ওপর আক্রমণ, পুলিশ হত্যা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বেছে বেছে হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ব্যবসায়ীদের আটক রেখে জোরপূর্বক অর্থ আদায়–এর সবকিছুই তাঁর সোনার ছেলেরা করেছে এবং বেগম জিয়া দলীয় প্রধান হিসাবে এসব জানতেন না এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসব সোনার ছেলেই বুথ দখল করে জোট প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে। এসব করেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হতেই দলটির ক্যাডাররা রাষ্ট্রপরিচালনার অংশীদারিত্ব চেয়েছে। তারা এখন রাতারাতি সম্পদ আহরণ করতে চায়। কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন দলীয় রাজনীতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ার জন্য পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। দলীয় রাজনীতি এমনইভাবে সংঘাতময় হয়ে আছে যে, সহযোগী সংগঠন হিসাবে ছাত্ররা তাতে জড়িয়ে পড়ে এবং দলের হয়ে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষ বাধায়। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনসমূহ এই ধরনের সহিংস তৎপরতায় বেশি সক্রিয় হয়। জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের প্রভাব এমনইভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দল কতটুকু শক্তিশালী অবস্থান নিতে পেরেছে তা অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্ররা কতটুকু শক্তিশালী তার ওপর নির্ভর করে। এবং সে কারণেই ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই সরকারী দল সমর্থক ছাত্ররা প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দখল করে। এক কথায় বলা যেতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতিই এখন দলীয় রাজনীতির শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এবং সে কারণে ছাত্ররাজনীতি সংঘাতময় হয়ে উঠেছে।